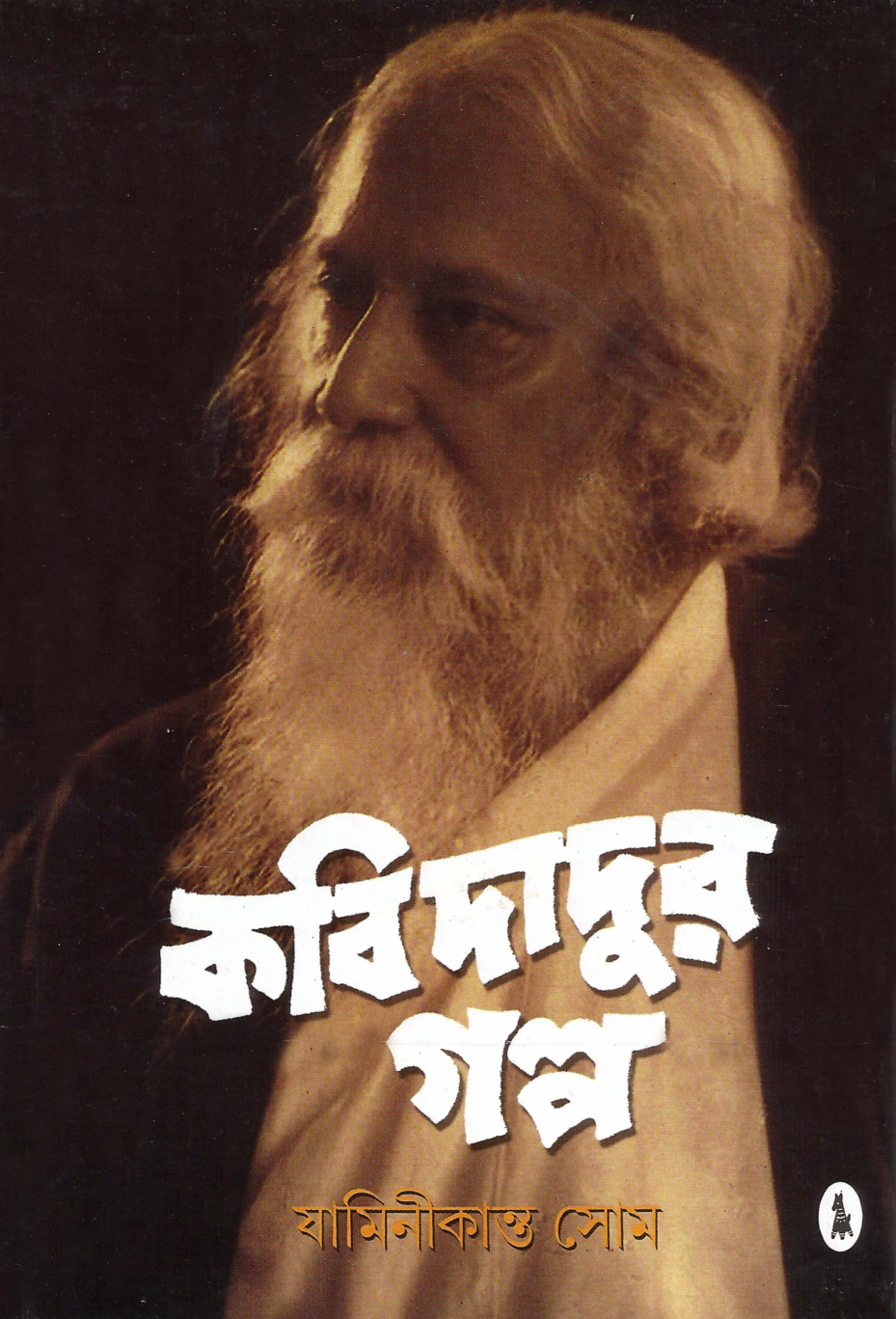

কবিদাদুর গল্প

যামিনীকান্ত সোম

কবিদাদুর গল্প

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
Click here

কবিদাদুর গল্প

যামিনীকান্ত সোম

লা ল মা টি

Kabidadur Galpa by *Jaminikanta Some*

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ ১৩৬৮
অক্টোবর ১৯৬১

প্রথম লালমাটি সংস্করণ :
রথযাত্রা ১৪১৭
১৩ জুলাই ২০১০

প্রকাশক :
নিমাই গরাই
লালমাটি
৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন (০৩৩) ২২৫৭ ৩৩০০

অলংকরণ :
শৈল চক্রবর্তী

অক্ষরবিন্যাস :
লালমাটি
১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রণ :
নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস
৩১এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৭

দাম : ৪০ টাকা

স্নেহভাজন

মণি মিষ্টু গীতাকে

কবিদাদুর গল্প • যামিনীকান্ত সোম

গঙ্গাজল দিয়ে যেমন গঙ্গা পূজা হয়, তেমনি কবিগুরুর কথা দিয়েই কবিগুরুর পূজা করেছি, শ্রদ্ধার সঙ্গে।

'কবিদাদুর গল্প'তে আছে তাঁর শৈশবের অতি মনোহর কাহিনী, কৈশোর এবং যৌবনের সাধনার কাহিনী এবং বার্ধক্যের অপূর্ব চিন্তাধারার কথা।

গল্পগুলি লেখা হয়েছে ছোটোদের জন্যই। কিন্তু বড়োদেরও, শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়লে, ভালোই লাগবে।

কবিদাদুকে প্রণাম করি।

রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষ

যামিনীকান্ত সোম

গ্রন্থটিতে আছে রবীন্দ্রনাথের শৈশবের মনোহর কাহিনি, কৈশোর ও যৌবনের সাধনার কথা এবং বার্ধক্যের অপূর্ব চিন্তাধারার রসবহুল গল্প। গ্রন্থটির সাহায্যে কবিকে এবং কবির সৃষ্টিধারাকে উপলব্ধি করা সহজ হবে। সমালোচক মনে করেন, শিশুদের উদ্দেশে লেখা গ্রন্থটি— বড়দেরও মন জয় করবে।

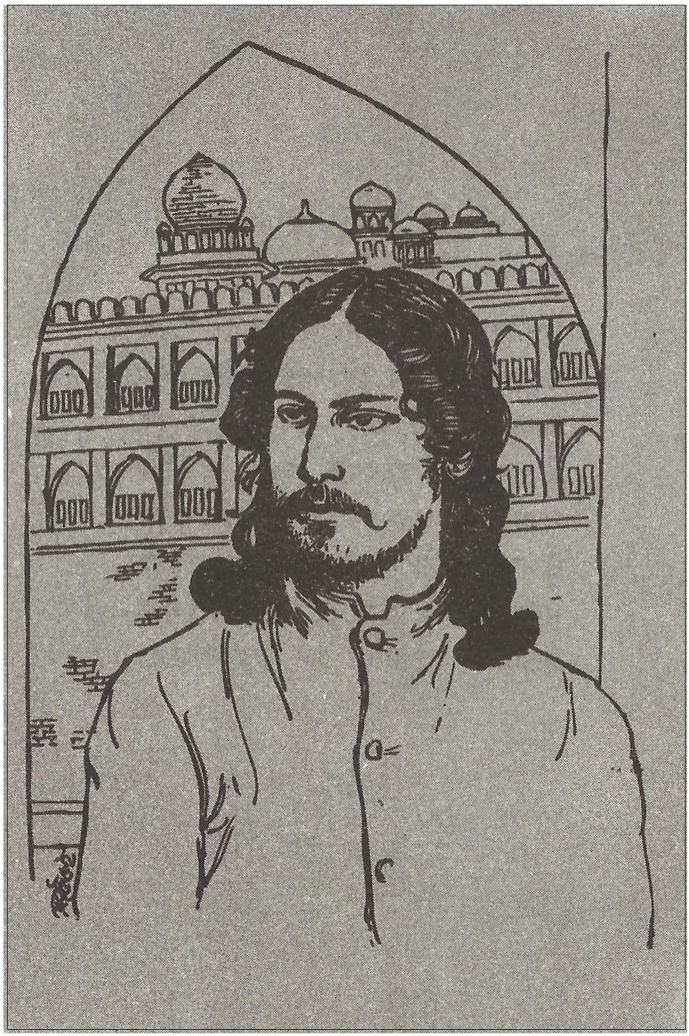

কবিদাদুর কথা অতি অপরূপ। তাঁর সব কথা যেন কবিতা। যেমন:

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম

আমি যাব রাজপুত্তুর হয়ে

ওই যে রাতের তারা
জানিস কি, মা কারা

এইসব পড়তে আর শুনতে যেমন মিষ্টি, কবিদাদুর কথাও তেমনিতরো মিষ্টি। মিষ্টি তো বটেই, অতি মনোহারি, অতি মধুর— ঠিক রূপকথার মতো লোভনীয়। কী কৌতূহল হয় শুনতে! তাঁর গল্প তাঁর কথাতেই বলি। এক জায়গায় আছে—

'যখন পেনেটির বাগানে ছিলুম, যখন পৈতের নেড়ামাথা নিয়ে প্রথমবার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম, যখন পশ্চিমের বারান্দার সবশেষের ঘরে আমাদের ইস্কুল-ঘর ছিল এবং আমি একটা নীল কাগজের ছেঁড়া খাতায় বাঁকা লাইন কেটে বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণনা লিখতুম, যখন তোষাখানার ঘরে শীতকালের সকালে

চিন্তা বলে একটা চাকর গুন্ গুন্ করে মধুকানের সুরে গান করতে করতে মাখন দিয়ে রুটি তোষ করত।

কেমন, চমৎকার কি না শুনতে! তারপর আবার বলছেন:

'তখন আমাদের গায়ে গরম কাপড় ছিল না, একখানা কামিজ পরে সেই আগুনের কাছে বসে শীত নিবারণ করতুম এবং সেই সশব্দ বিগলিত নবীন সুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে লুব্ধ দুরাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চুপ করে বসে চিন্তার গান শুনতুম—'

এই কথাগুলি কার? এগুলি বলেছেন কবিদাদু নিজে। কেমন, মিষ্টি নয় কি? এ তাঁর অতি ছোটোবেলার কথা। কথাগুলি তুলে দিলুম, তাঁরই এক চিঠি থেকে। এরকম চিঠি তাঁর অনেক আছে— অসংখ্য, অসংখ্য, অসংখ্য! আর সে-সব তো চিঠি নয়, যেন এক-একটি হীরের টুকরো। সেই সকল অতি মনোহারি ও মূল্যবান চিঠি তোমাদের ঠিক জায়গায় শোনাব। তখন দেখবে আর বুঝবে আমার কথা ঠিক কি না।

এখন শোনো তাঁর নিজের কথা— তাঁর ছোটোবেলাকার ছোটো-ছোটো গল্প। এ রকমের অতি মজার-মজার গল্প কত যে আছে, তার কি সীমা-সংখ্যা আছে? সে সকল অতি সুন্দর, অতি মনোহারি, অতি লোভনীয় শুনতে— ঠিক রূপকথার মতো। তা হবে না? কবিদাদুর কথা রূপকথাই তো!

কবিদাদুকে সবাই তোমরা দেখতে পাও ছবিতে। মুনি-ঋষির মতো, অপূর্ব মূর্তি। লম্বা পাকা দাড়ি, ধবধবে সাদা মাথা, অতি সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরই মতো ছোট্ট অতটুকুটি ছিলেন, তখন তাঁকে

দেখাত ঠিক যেন পুতুলটি। তাঁর সেই ছোটোবেলাকার গল্প যা পারি তোমাদের শোনাই। বেশ লাগবে শুনতে। এ তাঁরই কথা— বলতে গেলে তাঁরই ভাষা; আমি কেবল বলেই যাই। শোনো তাহলে।

ফুটফুটে ছেলেটি। বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারের লম্বা বারান্দায় খেলা করছেন। রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে চলেছে— 'বরীফ'! আর একজন হেঁকে চলেছে— 'চাই বেলফুল!' দেখছেন—

ফেরিওলা যাচ্চে ফেরি নিয়ে!
'চুড়ি চা—ই চুড়ি চাই' সে হাঁকে,
চীনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তার খুশি,
যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে!

এক চীনেম্যান এলো অদ্ভুত সাজে। সঙ্গে তার কত কী খেলনা। দেখে রবির কী আমোদ! এমন সময় তাঁর চেয়ে একটু বড়ো একজন, তাঁকে ভয় দেখাবার জন্যে জোরে চিৎকার করে উঠল— 'পুলিসম্যান! পুলিসম্যান!' পুলিসম্যানকে রবির খুব ভয়। শুনেছেন, সে লোকেদের ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। ছেড়ে তো দেয়ই না— কত রকমে কত কষ্ট দেয়। পুলিসম্যানের নাম শুনেই রবি দে-ছুট একেবারে বাড়ির ভিতরে— মায়ের কাছে গিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে বলছেন,— 'মা! পুলিসম্যান— পুলিসম্যান!' মা দেখলেন রবির মুখপানে চেয়ে। অল্প হাসলেন,

কিছু বললেন না। কথাটা তাঁর কানে এলো কি না কে জানে। রবি দেখলেন, কেউ কিছু বলছেন না। একটু এ-দিক ও-দিক করলেন। সামনে খোলা ছিল রামায়ণের মোটা বই। এক দিদিমার বই এখানা। এই বইখানা তিনি নিজের কোলে তুলে নিলেন। তারপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে একমনে পড়তে লেগে গেলেন বই খুলে। পড়ছেন,— রামচন্দ্র জটা-বাকল পরে, সীতা আর লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে, বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বনবাসে। এইটি পড়তে পড়তে করুণায় তাঁর দু-চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! পড়ারও ক্ষান্তি নেই, আর চোখের জলেরও বিরাম নেই। তখন বুড়ি দিদিমা এসে ছোট্ট রবির কোল থেকে রামায়ণখানা তুলে নিলেন, আর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন আদর করে।

ছোটো বেলাতেই রবির মনটি কত কোমল ছিল, দেখলে তো!

খুব ছোটো বেলাতে তাঁর কবিতার প্রথম জ্ঞানসঞ্চার হল, 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই কথাগুলি পড়ে। বলছেন তিনি,

> —কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও মনে পড়ে।

কবি বলেন—

> শিশুকালের স্মৃতি এখনো জেগে আছে— আর মনে পড়ে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।' ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।

বয়স তাঁর সাত-আট বছর। এক ভাগনে তাঁকে একদিন দুপুরবেলা ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন— তোমায় পদ্য লিখতে হবে। বললেন, চোদ্দ অক্ষরের ছাঁচে কথা ঢাললে সেটা জমে ওঠে পদ্যে।— স্বয়ং দেখলুম এই জাদুবিদ্যের ব্যাপার। হাতে-হাতে সেই চোদ্দ অক্ষরের ছাঁদে পদ্য জমে উঠল।

তখন কবিকে পায় কে! একজনের কৃপায় এক নীল কাগজের খাতা জোগাড় করলেন, আর তাতে পেন্সিল দিয়ে অসমান লাইন টেনে পদ্য লেখা শুরু করে দিলেন। কী রকম কবিতা শুনবে?

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

সবাই জেনে গেল তিনি পদ্য লেখেন। রবি তখন ইস্কুলে যান। ছেলেরা জানল তিনি কবি। মাস্টারমশায়ও শুনলেন। একদিন ডেকে বললেন— তুমি কবি? আচ্ছা আমি একটা পদ লিখে দিচ্ছি, তুমি পূরণ করো দেখি! লিখলেন মাস্টারমশাই—

রবি করে জ্বালাতন আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

রবি এর সঙ্গে জুড়ে দিলেন:

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

কেমন! চমৎকার মানিয়ে গেল কি না? তিনি কবিতা লেখা নিয়ে মেতে রইলেন।

দুই

ইস্কুলে তিনি যান, পড়েন, কিন্তু শুধু ছাত্র হয়ে থাকবার যে হীনতা, তা মেটাবার এক উপায় বার করলেন। তাঁদের বারান্দার এক কোণে তিনি এক ক্লাস খুলে বসলেন। ক্লাস খুললেন, ছাত্র কই? ছাত্র হল রেলিংগুলো। একটা চৌকিতে বসে, এক কাঠি হাতে করে রেলিংগুলোর উপর মাস্টারি করতেন। রেলিংগুলোর কে ভালো, কে দুষ্টু, কে বুদ্ধিমান, কে বোকা— সব তিনি ঠিক করে নিলেন। দুষ্টু রেলিং-এর উপর ক্রমাগত বেত পড়ত। বোকাদের ধমক দিতেন, বকুনি দিতেন। বলতেন, পড়াতে মন নেই তোর একটুও, বড় হলে করবি কী? কুলিগিরি করতে হবে যে। তাঁর এই মাস্টারি যে দেখে, সেই হাসে। এমনি ছিল রবির খেলা।

ইস্কুলে যান। কিন্তু মাস্টারদের ব্যবহার আদৌ মধুর ছিল না। তিনি বিরক্ত হয়ে ক্লাসের সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসে থাকতেন। প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেন না। সে সময় অন্য বিষয় ভাবতেন। এক বছর কাটল। ক্লাসের পরীক্ষা হল। তিনি পেলেন সকলের চেয়ে বেশি নম্বর। সবাই আশ্চয্যি। বললে,

পক্ষপাত করা হয়েছে। বড়োলোকের ছেলে কিনা? আবার হল পরীক্ষা। এবারেও পেলেন সবচেয়ে বেশি নম্বর। এমনি ছিলেন রবি বুদ্ধিমান।

তখন তিনি সাত-আট বছরের। কিন্তু তাঁর আরো ছোটোবেলাকার কথা নিজে তিনি যা বলেছেন, তার কথা শোনাই। তিনি ছিলেন চাকরদের অধীনে। কিন্তু অধীনতা ছিল না— মন ছিল স্বাধীন, মুক্ত। কারণ খাওয়ানো-পরানো, সাজানো-গোজানোর বালাই ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে, এখনকার ছেলের চক্ষে তা অপমানজনক। বয়স দশের কোঠা পার হওয়ার আগে কোনো দিন কোনো কারণেই মোজা পরেননি। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। এজন্য দুঃখ ছিল না। কিন্তু দুঃখ হত, জামাতে পকেট না থাকলে। পকেটে মারবেল, কাচ-ভাঙা, ঘুঁটি— এ সব রাখেন কী করে? চটি-জুতো একজোড়া থাকত। কিন্তু পা দুটো যেখানে থাকত সেখানে নয়। চটিজুতো আগে আগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলত। জুতো পরা হত বিফল। এমনি ছিলেন আমাদের ছোট্ট রবি।

আর তাঁর খাবার? খাবারের কথাও বলি। ছেলেরা খেতে বসত। লুচি থাকত রাশ করা একটা মোটা কাঠের বারকোশে। পরিবেশন-কর্তা চাকর ঈশ্বর। প্রথমে দুই-একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হতে সে ছেলেদের হাতে বর্ষণ করত। তারপর

ঈশ্বর প্রশ্ন করত, আরো দিতে হবে কি না। কোন্ উত্তরটি ঈশ্বরের রুচিকর হবে রবি তা জানতেন। তিনি আর চাইতেন না।

জলখাবারের ব্যবস্থাও বেশ মজার। ঈশ্বর ছেলেদের জন্য জলখাবার কেনবার পয়সা পেত। সে জিজ্ঞাসা করত, কী খেতে চান ছেলেরা। রবি তাকে খুশি রাখবার জন্যে শস্তা জিনিসের ফরমাস করতেন। যেমন, মুড়ি, না-হয় ছোলাসেদ্ধ, না-হয় চিনেবাদাম ভাজা প্রভৃতি অপথ্য। ছেলেবেলায় এমনিতরো ছিলেন ছোট্ট রবি।

তাঁর খেলা ছিল কত রকমের! শুনবে তাঁর আতাবিচি পোঁতার গল্প? বাগানের ওই আতাগাছটা দেখে ভাবলেন, কী বড়ো-বড়ো আতা! আমিও একটা আতাগাছ করব। কোথায়? কেন, ওই বারান্দায়। কেউ দেখবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে করব। তাঁর 'আতার বিচি' কবিতাতে আতাগাছ করবার কথা আছে। সেই কবিতার কিছু তুলে দিই। তাইতে বোঝো ব্যাপারটা—

আতার বিচি নিজে পুঁতে পাব তাহার ফল,
দেখব বলে ছিল মনে বিষম কৌতূহল।
তখন আমার বয়স ছিল নয়,
অবাক লাগত কিছুর থেকে কেন কিছুই হয়।
দোতলাতে পড়ার ঘরের বারান্দাটা বড়ো,
ধুলোবালি একটা কোণে করেছিলুম জড়ো।
সেথায় বিচি পুঁতেছিলুম অনেক যত্ন করে;
গাছ বুঝি আজ দেখা দেবে, ভেবেছি রোজ ভোরে।

তারপর বলছেন—

দু-মাস গেল, মনে আছে, সে দিন শুক্রবার
অঙ্কুরটি দেখা দিল নবীন সুকুমার।
* *
আমি তাঁকে নাম দিয়েছি 'আতাগাছের খুকু';
ক্ষণে ক্ষণে দেখতে যেতেম, বাড়ল কতটুকু।
* *
কিন্তু যেদিন মাস্টার ওর দিলেন মৃত্যুদণ্ড,
কচি কচি পাতার কুঁড়ি হল খণ্ড খণ্ড।
* *

তারপর আপন মনে বলছেন, আতা হলে তোমরাও খেতে। তা না, দিলে নষ্ট করে সুন্দর গাছটিকে।

ছোট্ট রবির কত কল্পনা, কত চিন্তা, কত খেয়াল! মনটি তাঁর বাড়ির চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। বাগানে, পুকুর-পাড়ে, গোলাবাড়িতে, সর্বত্র।

তিনি বলছেন—

জানলার নীচেই ছিল একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর। তার পুবদিকের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট। দক্ষিণ দিকে নারিকেল-শ্রেণি। আমি জানলার খড়খড়ি খুলে সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বইয়ের মতো দেখে প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়ে দিতুম। কত লোকে আসত সেই পুকুরে স্নান করতে! কেউ এসে দুই কানে আঙুল চেপে ঝুপ ঝুপ করে কতকগুলো ডুব পেড়ে যেত। কেউ বা ডুব না পেড়ে গামছায় জল তুলে ঘন-ঘন মাথায় ঢালতে থাকত। কেউ বা উপরের সিঁড়ি থেকে লাফ মেরে জলে পড়ত।

এইসব তিনি বসে বসে দেখতেন।

পুকুরটা নির্জন হয়ে গেলে বটগাছের তলাটা তাঁর মনকে অধিকার করত। গাছের চারিধারে অনেকগুলো ঝুরি নেমে তলাটাকে করে রেখেছিল অন্ধকার। এই দেখে এক জটিলতার সৃষ্টি হত তাঁর চোখে। এই বটের উদ্দেশ্যেই তিনি লিখেছিলেন—

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট?

বাড়ির বাইরে তাঁর যাওয়া ছিল বারণ। বাড়ির ভিতরেও সব জায়গায় যেমন খুশি তাঁর যাওয়া চলত না। বাড়ির ভিতরে একটা ছিল বাগান। সেই বাগানে একটা বাতাবিলেবু গাছ, একটা কুল গাছ, একটা বিলিতি আমড়া আর একসার নারকেল গাছ ছিল সম্পদ। এই ছিল তাঁর স্বর্গের বাগান। শরৎকালের ভোরবেলায় তিনি লুকিয়ে এই বাগানে আসতেন। সেই সময়কার শোভাতে তাঁর মন মুগ্ধ হত।

আর-এক ছিল গোলাবাড়ি। এ একটা পতিত জমি। এখানে ফুল নেই, কোনো গাছ নেই, নেহাত শুকনো। তবু এর প্রতি তাঁর টান ছিল। আসবার সুযোগ পেলেই এখানে আসতেন। এই জায়গাটা পতিত বলে, নির্জন বলেই বোধহয় এর প্রতি তাঁর আকর্ষণ।

খেলার সঙ্গিনী একটি ছিল তাঁর। তাঁর মতন অতটুকু। খেলার সঙ্গিনী বলত— আজও গেছলাম সেখানে। কিন্তু মেয়েটির সঙ্গ ধরবার শুভ যোগ একদিনও তাঁর হচ্ছে না। সে

এক আশ্চর্য জায়গা। জায়গাটিও যেমন আশ্চর্য, সেখানের খেলাও তেমনি আশ্চর্য, আর খেলার সরঞ্জামও তেমনি অপরূপ। সঙ্গিনীর কথা শুনে তাঁর মনে হত, জায়গাটি খুবই কাছে। সঙ্গিনী হেসে-হেসে বলত— সে রাজার বাড়ি। রবি জিজ্ঞাসা করতেন— কোথায় সে রাজার বাড়ি? একতলায়, না দোতলায়? না, আমাদের বাড়ির বাইরে? মেয়েটি হেসে জবাব দিত— এই বাড়ির মধ্যেই। রবি শুনে বিস্মিত হয়ে বলতেন, বাড়ির সব ঘরই তো আমি দেখেছি। সে ঘর তবে কোথায়? জবাব পেতেন— সে রাজার বাড়ি এই বাড়ির মধ্যেই।— এই বাড়ির মধ্যেই?

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো!
সে বাড়ি কি থাকত, যদি লোকে জানতে পেত?
রুপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে-থাকে সিঁড়ি ওঠে সাদা হাতির দাঁত।

রবি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সঙ্গিনীর মুখের পানে চেয়ে থাকতেন।

কি মাটি, কি জল, কি গাছপালা, কি আকাশ সমস্তই তখন কথা বলত ছোট্ট রবির সঙ্গে। মনটিকে তাঁর কোনোমতেই উদাসীন থাকতে দেয়নি। এমনি ছিল ছোট্ট রবির খেলা।

তিন

রবি একটু বড়ো হয়েছেন। শাসন হয়েছে কিছু ঢিলে। কবিতায় এখন তাঁর খুব মন। কত কত কবিতা লেখেন। যেমন—

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখি বলে— 'খাঁচার পাখি আয়,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।'
খাঁচার পাখি বলে— 'বনের পাখি আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'

তারপরে? তারপরে—

বনের পাখি বলে— 'না;
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'
খাঁচার পাখি বলে— 'হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।'

এইরকম কত কবিতা! আর এক—

আমাকে ধরিতে যেই
এল ছোটোকাকা
স্বপনে গেলাম উড়ে
মেলে দিয়ে পাখা।

দুই হাত তুলে কাকা
বলে, থামো থামো,
যেতে হবে ইস্কুলে
এইবেলা নামো।

তারপরে আরও মজা—
আমি বলি, কাকা মিছে
করো চেঁচামেচি,
আকাশেতে উঠে আমি
মেঘ হয়ে গেছি।
ফিরিব বাতাস বেয়ে
রামধনু খুঁজি,
আলোর অশোক ফুল
চুলে দেব গুঁজি।

তারপরে?
যেমনি এ কথা বলা
অমনি হঠাৎ
কড় কড় রবে বাজ
মেলে দিল দাঁত।
ভয়ে কাঁপি, মা কোথাও
নেই কাছাকাছি!
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি
বিছানায় আছি।

আর এক—

ডিঙি চলে ধিকি ধিকি,
নদীর ধারা মিহি।
দুপুর-রোদে আকাশে চিল
ডাক দিয়ে যায় চিঁহি।

লখা চলে ছাতা মাথায়,
গৌরী কনের বর—
ড্যাঙ ড্যাঙা ড্যাঙ বাদ্যি বাজে
চড়ক-ডাঙায় ঘর।

আবার বলছেন—

আমি ভাবি, ঘোড়া হয়ে
মাঠ হব পার।
কভু ভাবি, মাছ হয়ে
কাটিব সাঁতার।
কভু ভাবি, পাখি হয়ে
উড়িব গগনে।
কখনো হবে না সে কি
ভাবি যাহা মনে?

চার

কিছু তাঁর কবিতায় কথা হল। এবার দু-একটি মজার গল্প শোন। পুপুদিদির সঙ্গে কবিদাদুর গল্প জমেছে চমৎকার। এ গল্প অনেক পরের হলেও এখানে বলে নিই।

দিদি বলছে— জান দাদামশায়, বাঘরা কখখনো নাপিতকে খায় না।

দাদামশায় বললেন—কেন বলো দেখি।

খেলে ওদের পাপ হয়। খেলে গঙ্গাস্নান করতে হয়।

খাওয়া-ছোঁয়ায় বাঘের এত বাছবিচার আছে, জানলে কী করে দিদি।

পুপু খুব সেয়ানার মতো মুখ টিপে হেসে বললে— আমি সব জানি।

আর, আমি জানি নে?

এই কথায় পুপুদিদি চেয়ে থাকে অবাক হয়ে; তারপর বলছে—

কী জান বলো তো।... বাঘরা যদি এতই ধার্মিক, তাহলে জীবহত্যা করে কাঁচা মাংস খায় কী করে!

সে বুঝি যে-সে মাংস। ও-যে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা!... ওদের সনাতন হালুম মন্ত্র... তাকে কি হত্যা বলে?

যদি হালুম-মন্ত্র ভুলে যায়?

তাহলে ওরা বিনা মন্ত্রে যে জীবকে মারে পরজন্মে সেই জীব হয়েই জন্মায়। ওদের ভারি ভয় পাছে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

মানুষ হয়ে জন্মাবার কথায় ভয়ের কথা শুনে পুপুদিদির ভারি বিস্ময়। অবাক হয়ে বলছে—

কেন?

ওরা বলে মানুষের সর্বাঙ্গ টাকপড়া, কী কুশ্রী! তারপরে সামান্য

একটা লেজ, তাও নেই মানুষের দেহে।

... আবার দেখো-না, ওরা খাড়া দাঁড়িয়ে সঙের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে— দেখে আমরা হেসে মরি।

বাঘেদের মজার গল্প শুনে পুপুদিদি অবাক।

দাদামশাই বলে চলেছেন—

ওরা বলে—

আধুনিক বাঘের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানী শার্দোল্য তত্ত্বরত্ন বলেন, জীবসৃষ্টির শেষের পালায় বিশ্বকর্মার মাল মশলা যখন সমস্তই কাবার হয়ে গেল তখনই মানুষ গড়তে তাঁর হঠাৎ শখ হয়। বেচারাদের পায়ের তলার জন্য থাবা দূরে থাক কয়েক টুকরো খুরের জোগাড় করতে পারলেন না, জুতো পরে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পারে— আর, গায়ের লজ্জা ঢাকে ওরা কাপড় জড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হল লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।...

এই কথা শুনে পুপুদিদি আশ্চয্যি হয়ে ভাবতে লাগল।

শেষকালে দাদামশায় বললেন— কী দিদি চুপ করলে যে।... এখনো শেষ হয় নি। বাঘের এক ছড়া শুনবে?

ছড়া?— শোনাও-না।

আচ্ছা শোনো তবে।

সুঁদর বনের কেঁদো বাঘ,
সারা-গায়ে চাকা চাকা দাগ।

সে এসে পুঁটুকে বলছে—

... নেই তোর লজ্জা?
খাব তোর হাড় মাস মজ্জা।

এই কথায় পুঁটুর মনে ভয়। কিন্তু মুখের আস্ফালন কত!

পুঁটু বলে, ছি ছি ওরে বাপ,
মুখেও আনিলে হবে পাপ।
জান না কি আমি অস্পৃশ্য,
মহাত্মা গাঁধিজির শিষ্য।
আমার মাংস যদি খাও
জাত যাবে জান না কি তাও।
পায়ে ধরি করিয়ো না রাগ!—

এই কথায় মজা দাঁড়াল। বাঘ হতভম্ব এই কথায়—

ছুঁস নে ছুঁস নে, বলে বাঘ,
আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,
বাঘনা-পাড়ায় বদনাম
রটে যাবে; ঘরে মেয়ে ঠাসা,
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা
দেবী বাঘা-চণ্ডীর কোপে।...

জান পুপুদিদি? আধুনিক বাঘেদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে—।... ঘোরতর দলাদলি বেধে গেছে।...

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধকালের ওই মজার গল্পটি এখানে শোনালুম। আরও এই ধরনের গল্প শোনাব পরে। এখন রবির বড়ো হওয়ার গল্প বলি।

রবি বড়ো হলেন। বড়ো হলেন কীসের মধ্য দিয়ে? তাঁর

বাড়িটি ছিল একটি শিক্ষায়তন। সেখানে কত বিশিষ্ট লোক আসতেন। তাঁর দাদারাও ছিলেন গুণী। তাঁরা আট ভাই। রবি সকলের ছোটো। সমস্ত পরিবার একসঙ্গে করলে ভাই-বোনে তাঁরা আরও অনেকগুলি। এই বৃহৎ পরিবারের ছেলেমেয়েরা সবাই গুণী। কবিতায়, গানে, চিত্রে, নাটক-অভিনয়ে এঁদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। রবির তরুণ মনের উপর এঁদের সকলের প্রভাব পড়ল।

বিশিষ্ট লোকেরা আসতেন। তাঁদের কেউ বা সাহিত্যিক, কেউ বা কবি, কেউ বা দার্শনিক, কেউ বা মহা ধার্মিক। এঁদের সকলেরই প্রভাব পড়ল রবির উপর। এ-রকম বড়ো আদর্শ আর ছিল কোথায়?

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িই ছিল সেই সেকালে দেশের সকল মঙ্গলজনক কাজের অগ্রণী। এই বাড়িরই সাহায্যে হিন্দুমেলা নামে একটি মেলার সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে ধারণা করবার চেষ্টা সেই হয় প্রথম। এই মেলাতে দেশের স্তবগান হত, দেশভক্তির কবিতা পড়া হত, দেশি শিল্প ব্যায়াম দেখানো হত আর দেশি গুণী লোকদের পুরস্কার দেওয়া হত। চোদ্দো বছরের ছেলে রবি এই মেলাতে, বিপুল জনসভায় নিজের লেখা সুদীর্ঘ 'স্বদেশী' [হিন্দুমেলায় উপহার] কবিতাটি পড়েন উচ্চৈঃস্বরে। এই কবিতাটি সকলের কাছে সুখ্যাতি পেয়েছিল।

রবি নয় বছর বয়সে ম্যাকবেথ অনুবাদ করেছিলেন, সে

কথা নিজেই তিনি বলেছেন। ম্যাকবেথ নাটকের ডাইনিগুলোর কথার অনুবাদ কি ভাবের ছিল তা তুলে দিই:

১ম ডাইনি। এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি?
২য় ডাইনি। মারতেছিলাম শুয়োরগুলি!
৩য় ডাইনি। তুই ছিলি বোন কোথায় গিয়ে?
১ম ডাইনি। দেখ,— একটা মাঝির মেয়ে
গোটা কতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচমচিয়ে
কচমচিয়ে কচমচিয়ে...।

কেমন! বেশ মজার কি না! রবি ছিলেন এমনি বাহাদুর!

ইস্কুলগুলো রবির পছন্দ ছিল না। কত ইস্কুলেই তো গেলেন। যেমন— খুব ছোটোবেলায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, তারপরে নর্ম্যাল স্কুল, তারপরে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি, সবশেষে সেন্ট জেভিয়ার্স। কোনোটাই তাঁর পছন্দ নয়। ইস্কুল যাওয়া ছেড়ে দিয়ে শেষে নিজের বাড়িতেই পড়তে লাগলেন। কী রকম পড়তেন? তা তাঁর নিজের কথাতেই শোনাই। বলছেন:

> ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে লেঙটি পরিয়া কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত।

বিকালে ড্রয়িং এবং জিমনাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার পর ইংরাজি পড়া। রাত্রি নটার পর ছুটি।

এ ছাড়া আরও আছে—

রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে যন্ত্রতন্ত্র-যোগে প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাৎলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারি জল নীচে নামিতে থাকে এবং এইজন্যই জল টগবগ করে।

তারপর আরও বলছেন এ বিষয়ে। বলছেন—

দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয় এ কথাটাও যে-দিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে রবিবারে মাস্টারমশায় না আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।

রবির সবেমাত্র উপবীত হয়েছে। তাঁর তখন নেড়া মাথা। হঠাৎ একদিন তাঁর বাবা তাঁকে হিমালয়ে বেড়াতে নিয়ে চললেন। রবি এই প্রথম বাড়ির বার হলেন দূর পথে যাবার জন্য। প্রথমে গেলেন বোলপুরের শান্তিনিকেতনে রেলে চড়ে। রেলে চড়ে কী তাঁর আনন্দ! গাছপালা, বাড়িঘর সব ছুটে চলেছে উল্টো দিকে। আর তিনি মজা করে রেলগাড়িতে বসে রয়েছেন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে এক ছোটো নারকেল গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে আপন মনে কবিতা লেখা,

কত বেড়ানো আর বেড়াতে বেরিয়ে নানা রকমের পাথর জোগাড় করা— এই সব হল তাঁর কাজ। আসবার আগে শুনেছিলেন, বোলপুরের ধানক্ষেত থেকে চাল সংগ্রহ করে ভাত রেঁধে রাখালদের সঙ্গে একত্রে বসে খাওয়া, এই একটা মস্ত খেলা সেখানকার। কিন্তু এখানে শুধু মরুপ্রান্তর। মরুপ্রান্তরের মধ্যে কোথায় ধানের ক্ষেত! রাখাল বালকদেরও চিনবার উপায় ছিল না।

তারপর বোলপুর থেকে কত জায়গা পার হয়ে— যেমন, এলাহাবাদ, কানপুর হয়ে অমৃতসরে গেলেন। অমৃতসরে মাসখানেক থেকে একেবারে চললেন হিমালয়ের ডালহৌসি পাহাড়ে। পাহাড়ের পথের অতি অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে চললেন। তাঁদের থাকবার জায়গা হল সবচেয়ে উঁচু চূড়ায়।

এখানে এসে তিনি কত যে বেড়াতেন একা-একা আপন মনে, তার কি ঠিক আছে? নীচের দিকে ছিল মস্ত বড়ো কেলুবন। এই বনে বিরাট-বিরাট গাছেরা সব বড়ো বড়ো দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি দেখতেন, বেড়াতেন; কিন্তু তাঁর ভয় করত না একটুও। কত মজা এখানে ছিল! খুব ভোরে তিনি সূর্যোদয় দেখতেন, কী অপূর্ব তার শোভা! আর সন্ধেবেলায় সূর্যাস্তের শোভাও ততোধিক রমণীয়।

সকাল-সন্ধ্যায় তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে উপাসনা করতেন। বাবার কাছে তিনি সংস্কৃত ও ইংরিজি শিখতেন এবং মুখে মুখে

জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা হত আর নক্ষত্র সকল ভালো করে চেনা হত। এই অপরূপ আবহাওয়ার মধ্যে তিনি অনেক নূতন কিছু শিখলেন। তাঁর মনের ভাব হল উন্নত ও প্রশস্ত। এখানেও তিনি কবিতার রসে ভরপুর হয়ে রইলেন। এখানে তিন মাস থাকবার পর তাঁর বাবা তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর মায়ের দৈনিক আসরে রবির হল বিশিষ্ট এক স্থান। মায়ের সান্ধ্য আসরে হিমালয় ভ্রমণের কত রকমের গল্প শোনাতেন। মা শুনে অবাক হতেন। শুধু কি গল্প শোনানো? বাল্মীকি রামায়ণ থেকে অনুস্বার-বিসর্গ-সুদ্ধ কত টুকরো-টুকরো শ্লোক আউড়ে দিতেন। সে সকল শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, মা তাঁর জানবেন কী করে? আরও কত মজার কথা : জানো মা, সূর্য এই পৃথিবীর ন-কোটি মাইল দূরে থেকে পৃথিবীকে টেনে রেখেছে, আর পৃথিবী বন-বন করে ঘুরছে। মা তাঁর ছোটো ছেলের মুখে এইসব গল্প শুনে অবাক হয়ে যেতেন।

মা বলতেন, সব ছেলের মধ্যে রবিই আমার কালো। তিনি রবিকে খুব কষে রূপটান সর-ময়দা মাখাতেন। মায়ের সেই কালো ছেলেই জগৎ আলো করে রয়েছেন।

ছয়

রবির বয়স যখন সতেরো, তাঁকে বিলেতে পাঠানোর কথা হল। তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বিলেতে যাবেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে তাঁকে আমেদাবাদে নিয়ে গেলেন। তিনি সেখানকার জজ। রবি সেখানে গিয়ে কিছুদিন রইলেন।

শাহীবাগে ছিল জজের বাসা। শাহীবাগ ছিল এক বাদশাহী প্রাসাদ। এই প্রকাণ্ড প্রসাদে রবি একাই থাকেন। কারণ, বউদিদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে তখন বিলেতে। শাহীবাগ বিচিত্র স্থান। প্রাসাদের নীচে সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। তিনি এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। এই প্রাসাদটা তাঁর বড়োই রহস্যময় ঠেকত। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, কত কী কল্পনা করতেন। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একটানা ঘুরে বেড়ানো তাঁর এক উপসর্গ ছিল। তাঁর মনে হত, সেকালের সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। বলেছেন রবি—

> আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের।

বলছেন সে আজ কত কালের কথা। শুনছেন—

> নহবৎখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্টপ্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে

ঝক্‌ঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চারদিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুস্‌ফাস্‌। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটেছে গোলাপজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনি।

এই ক্ষুধিত পাষাণের গল্পটি এমনি অপূর্ব যে তার তুলনা পাওয়া যায় না। অতি রোমাঞ্চকর। এই গল্পটি অবশ্য পড়বার মতো।

সাত

তারপর তিনি বিলেত যাত্রা করলেন। বিলেতে অর্থাৎ লন্ডনে পৌঁছোবার আগে গেলেন ইটালিতে। তিনি ছিলেন এক মহা কাল্পনিক। তাঁর বড়ো বড়ো কল্পনার সঙ্গে এখানকার কিছুই মিলল না। কিন্তু প্যারিস গিয়ে দেখে-শুনে অবাক হলেন। সেখান থেকে এক চিঠি তিনি লিখেছেন:

সকালবেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কী জমকালো শহর!... মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। মনে হল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কী আবশ্যক। হোটেলে গেলেম, এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড... স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জনকোলাহল প্রভৃতিতে অবাক হয়ে যেতে হয়।

এখান থেকে গেলেন বিলেতে। মেজো বউঠাকরুনের আশ্রয়ে গিয়ে বিদেশের প্রথম ধাক্কা আর তাঁর গায়ে লাগল

না। তখন শীত এসে পড়েছে। কনকনে শীত। আকাশে শুভ্র জ্যোৎস্না, আর পৃথিবী সাদা বরফে ঢাকা। এমন আশ্চর্য বিরাট সৌন্দর্য আর কখনো তিনি দেখেন নি।

বউঠাকুরানীর যত্নে আর ছেলেদের উৎপাত উপদ্রবে আনন্দে তাঁর দিন বেশ কাটতে লাগল। এই দুটি শিশুর মন ভোলাবার, তাদের হাসাবার, আমোদ দেবার নানা উপায় তিনি উদ্ভাবন করতেন।

এক ইস্কুলে তিনি ভর্তি হলেন। প্রথমে তাঁর ভালো না লাগলেও ভালো-না-লাগার ভাব বেশিদিন রইল না। সেখানকার ছেলেমেয়েরা সব স্বাধীন। তাদের পৌরুষভাব দেখে অবাক হলেন। গুরুজনেরা তাদের প্রতি পদে বাধা দেয় না। সেখানকার চাকরদের মধ্যেও দাসত্বের ভাব নেই। কাউকে অন্ধ আজ্ঞা পালন করতে হয় না। বিলেতের লোকজনও খুব সৎ আর ভদ্র। এ সব তাঁকে খুব আকর্ষণ করল।

কিছুদিন পরে তাঁকে ঘরের বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হল। একটি ডাক্তারের বাড়িতে তিনি বাসা নিলেন। তারপর ভর্তি হলেন লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে। ইংরিজি সাহিত্য পড়াতেন এক বিখ্যাত অধ্যাপক। সে তো পড়ার বই থেকে চালান-দেওয়া শুকনো মাল নয়! সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের মনের মিলন। এখানেও তাঁর কবিতা লেখা বা গান লেখার বিরাম ছিল না। গান গাওয়ারও বিরাম ছিল না।

কিন্তু বিলেতে তাঁর বেশি দিন থাকা হয় নি। তাঁর দেশের মাটি তাঁকে টান দিচ্ছিল। বলছেন রবি—

> বিলেতে গেলেম, ব্যারিস্টার হইনি। নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব পশ্চিমের হাত মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।

প্রায় এক বছর পরে তিনি দেশে ফিরে এলেন। বিলেতে তিনি কী শিখলেন? একটি খুব বড়ো জিনিস তিনি ও-দেশ থেকে পেলেন। সেটি হল, দেশের হোক বা বিদেশের হোক, মানুষের প্রকৃতি, মানুষের মন সব দেশেই সমান। এ দেশ, ও দেশ সব দেশেই সমস্ত মানুষের মন এক। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ জগতে সবচেয়ে বড়ো সম্পদ— এই সত্যটি তাঁর মনে দৃঢ় হয়ে গেল। এই ইউরোপ ভ্রমণ তাঁর তরুণ মনটি পরিস্ফুট হওয়ায় বিশেষ সহায়ক হল।

আট

বিলেত থেকে ফিরে এসে রবি গান আর কবিতার মধ্যে ডুব দিলেন বলা চলে। কবিতা চর্চা আর গান চর্চা ছাড়া অপর কোনো কাজই তাঁর রইল না। প্রহরের পর প্রহর গান গেয়েও

তাঁর ক্লান্তি বোধ হত না। কোনো রকম একঘেয়েমি তাঁর ভালো লাগত না।

অল্পদিন পরে তিনি এক অপূর্ব গীতিনাট্য লিখলেন, তার নাম 'বাল্মীকি-প্রতিভা'। এই নাটিকার কোনো কোনো গান বিলিতি সুর থেকে নেওয়া। আইরিশ সুরের গানও এতে আছে। এ এক অদ্ভুত নাটিকা। এই গীতিনাট্য অভিনয় হয় তাঁরই বাড়িতে বিশিষ্ট এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের সামনে। তাঁর বয়স তখন বাইশ বছর। নিজে তিনি বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর দু-একটি গান এখানে তুলে দিই। ডাকাতেরা গাইছে:

এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।...
ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে
কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে রয়েছেন কালী,
সমুখে রয়েছে জয়।

আর একটি গান:

গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন!
লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাবতে লাগে দাঁতকপাটি,
তাই, মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন!

তাঁর মন তখন আনন্দে ভরপুর। রাস্তা দিয়ে মুটে মজুর চলে যাচ্ছে, মা ছেলে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা

গোরু আর-একটা গোরুর গা চেটে দিচ্ছে— এ সব তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপারই তাঁর কাছে কত বড়ো। লিখলেন তিনি:

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা সখী বসিয়া চোখোচোখি,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন পুলকে ভরা মন,
ডাকিছে, 'ভাই ভাই' আঁখিতে আঁখি তুলি।

রবির বয়স বাড়তে লাগল। রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতরের এই সুরটি থেকেই জাগ্রত হল বিশ্বজগতের মিলনের সুর। তিনি লিখলেন:

হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর!

এই রকম অপরূপ কবিতা তো লিখতেনই, গানও লিখতেন অফুরন্ত। কী রকম ভাবে গান লিখতেন সে বিষয়ে

নিজেই তিনি বলছেন:

> জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গীতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।

এইভাবে ছুটে চলল কবির গানের ফোয়ারা।

নয়

এসব তো হল চমৎকার। কিন্তু কবিদাদু দেশের জন্য কি কিছু করেন নি? কে বললে করেন নি। সবই তিনি করেছেন দেশের জন্যেই। তাঁর মতো করে আবার কেউই করেন নি।

তিনি 'সাধনা' নামে এক পত্রিকা বার করেন। কবিদাদুর 'সাধনা' খানি তাঁর প্রাণের বস্তু। সেই 'সাধনা'ই ছিল তাঁর প্রকৃত স্বদেশ-সাধনার পথ। এতে তিনি সমাজ, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম— অর্থাৎ সকল বিষয়েই একক ভাবে লেখনী চালনা করতেন। প্রতিভার এ-রকম বিস্ময়কর ব্যাপার কোনো দেশের কোনো সাহিত্যিকের জীবনে কিন্তু দেখা যায় নি। এই 'সাধনা' কাগজ রইল না, কিন্তু এটি ছিল কবিদাদুর অসামান্য প্রতিভার পরিচয়। তিনি তখন যুবক।

তারপর এল স্বদেশী যুগ। স্বদেশীর কাজে তিনি পুরোপুরি লাগলেন। ১৯০৫ সালে, অক্টোবরে রাখি-উৎসবের দিন। তাঁর রচিত রাখি-সংগীত কে না জানেন:

ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই।
... ...
বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল—
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
... ...
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

সকালে গঙ্গায় স্নান করে সদলে চললেন সর্বসাধারণের হাতে রাখি বাঁধতে বাঁধতে। সঙ্গে অসংখ্য লোক।

স্বদেশীর কাজে পুরোপুরি লাগলেন তিনি। কত তখন কাজ। ভিক্ষাপাত্র হাতে টাকা তোলা, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা, স্বদেশী সমাজ গঠন করা, পল্লীসংগঠনের কাজে লাগা—এই-রকম কত কাজ। তাছাড়া, বক্তৃতা করা আর লেখা—লেখা আর বক্তৃতা করা। করেন নি কী! সবই করেছেন, আর বেশ ভালো করেই করেছেন।

তাঁর প্রাণের প্রাণ হল এই বাংলা দেশ। তাঁর সেই সুমধুর

গানটি কি বাঙালির প্রাণে গাঁথা হয়ে নেই?

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, মরি হায় হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে,
কী দেখেছি মধুর হাসি॥

কিন্তু তারপর? এক দিন কোথাও কিছু নেই, এই সব স্বদেশী কাজ তিনি ছেড়ে-ছুড়ে বসলেন। ছেড়ে-ছুড়ে চলে গেলেন তাঁর শান্তির আশ্রম শান্তিনিকেতনে। বন্ধুরা অবাক হয়ে গেলেন এই ব্যাপার দেখে। বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি বিদায় নিলেন:

বিদায় দেহো ক্ষমো আমায় ভাই
কাজের পথে আমি তো আর নাই!
এগিয়ে সবে যাও-না দলে দলে
জয়মাল্য লও-না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়া-তলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই!

কিন্তু তিনি কেন বিদায় নিলেন? কেন ছেড়ে দিলেন এ পথ? ছেড়েই দিলেন তিনি এ পথ। অন্য পথ ধরলেন। এ সেই পথ, যে-পথ কর্মের উত্তেজনা থেকে সরিয়ে নিয়ে জীবনকে ডুবিয়ে দেয় অন্তরের মধ্যে আর আনন্দের মধ্যে।

অন্য সব ভুলে তিনি মগ্ন হলেন তারই মধ্যে।

মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে,
পাখির গানে বাঁশির তানে
কম্পিত পল্লবে!
... ...
ভুলে গেলেম কিসের তরে
বাহির হলেম পথের পরে
ঢেলে দিলেম চেতনা মোর
ছায়ায় গন্ধে গানে!

দশ

কবির জীবনের ত্রিশটি বছর কাটল এই ভাবে।

এই সময় তাঁর পিতা তাঁকে জমিদারি-কাজ দেখবার ভার দিলেন। এ কাজের ভার পেয়ে তিনি ভড়কে গেলেন। জমিদারি? এ-কাজের তিনি কী বোঝেন? কিন্তু তাঁকে যেতেই হল। পিতার আদেশ।

জমিদারিতে যাবেন পরে, গিয়ে কাজ দেখবেন পরে, কিন্তু তাঁর বলা আরও দু-একটি মজার মজার গল্প আর কবিতা শোনাই। এ সব অনেক পরে বলা হলেও এইখানেই তা বলে নিই।

পুপুদিদির সঙ্গে তাঁর কত গল্প হয়। সে গল্পের একটি শুনিয়েছি আগে। আর-একটি শোনাই। কবিদাদু বলছেন:

সন্ধেবেলায় মাঠে বসে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছি এমন সময় শেয়াল এসে বললে, দাদা, তুমি নিজের কাচ্চাবাচ্চাদের মানুষ করতে লেগেছ, আমি কী দোষ করেছি?

জিজ্ঞাসা করলেম, কী করতে হবে শুনি।

শেয়াল বললে, নাহয় হলুম পশু, তাই বলে কি উদ্ধার নেই? পণ করেছি, তোমার হাতে মানুষ হব।

শুনে মনে ভাবলুম, সৎকার্য বটে।

ভাবতেই লাগল, ভাবতেই লাগল। ভেবে ভেবে জিজ্ঞাসা করলে:

তোমার এমন মতলব হল কেন?

সে বললে, যদি মানুষ হতে পারি তাহলে শেয়াল-সমাজে আমার নাম হবে, আমাকে পুজো করবে ওরা।

আমি বললুম, বেশ কথা।

বন্ধুদের খবর দেওয়া গেল। তারা খুব খুশি। বললে, এটা কাজের মতো কাজ বটে। পৃথিবীর উপকার হবে। কজনে মিলে একটা সভা করলুম। তার নাম দেওয়া গেল, শিবা-শোধন-সমিতি।

সভা তো হল। কিন্তু শিবা-শোধন সমিতির আড্ডা বসবে কোথায়?

পাড়ায় আছে অনেক কালের একটা পোড়ো চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে রোজ রাত্তির নটার পরে শেয়াল-মানুষ-করার পুণ্যকর্মে লাগা গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, বৎস, তোমাকে জ্ঞাতিরা কী নামে ডাকে?

শেয়াল বললে, হৌ-হৌ।

আমরা বললুম, ছি ছি, এ তো চলবে না। মানুষ হতে চাও তো প্রথমে নাম বদলাতে হবে, তার পরে রূপ। আজ থেকে তোমার নাম হল শিবুরাম।

শুনেই শেয়ালটা চমকে উঠল। চুপ করে থেকে পরে বললে:

আচ্ছা। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল, হৌ-হৌ নামটা তার যে রকম মিষ্টি লাগে, শিবুরাম তেমন লাগল না। উপায় নেই, মানুষ হতেই হবে।

প্রথম কাজ হল তাকে দু-পায়ে দাঁড় করানো। অনেক দিন লাগল। বহু কষ্টে নড়্‌বড়্‌ করতে করতে চলে, থেকে থেকে পড়ে পড়ে যায়। ছ-মাস গেল দেহটাকে কোনোমতে খাড়া রাখতে। থাবাগুলো ঢাকবার জন্য পরানো হল জুতো মোজা দস্তানা।

উপস্থিত সকলের মুখ টিপে টিপে কী হাসি।

অবশেষে আমাদের সভাপতি গৌর গোঁসাই বললেন, শিবুরাম, এইবার আয়নায় তোমার দ্বিপদী ছন্দের মূর্তিটা দেখো দেখি, পছন্দ হয় কি না।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে শিবুরাম অনেকক্ষণ ধরে দেখলে। শেষকালে বললে, গোঁসাইজি, এখনো তোমার সঙ্গে তো চেহারার মিল হচ্ছে না।

মিল কখনো হয়? হবে কী করে! সকলের তখন চাপা হাসি।

গোঁসাইজি বললেন, শিবু, সোজা হলে কি হল। মানুষ হওয়া এত সোজা নয়, বলি ল্যাজটা যাবে কোথায়, ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পার।

শিবুরামের মুখ গেল শুকিয়ে। শেয়াল পাড়ায় দশবিশ গাঁয়ের মধ্যে ওর ল্যাজ ছিল বিখ্যাত। সাধারণ শেয়ালরা ওর নাম দিয়েছিল, 'খাসা-লেজুড়ি', যারা শেয়ালি- সংস্কৃত জানত তারা সেই ভাষায় ওকে বলত 'সুলোমলাঙ্গুলী'।

কী করবে, কী করবে। ভাবতে লাগল।

দু-দিন গেল ওর ভাবতে, তিন রাত্রি ওর ঘুম হল না। শেষকালে বৃহস্পতিবারে এসে বললে, রাজি।

পাটকিলে রঙের ঝাঁকড়া রোঁয়াওয়ালা ল্যাজটা গেল কাটা, একেবারে গোড়া ঘেঁষে।

সভ্যেরা সকলে বলে উঠল, অহো, পশুর এ কী মুক্তি! ল্যাজবন্ধনের মায়া ওর এতদিনে কেটে গেল। ধন্য!

শিবুরাম একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললে। চোখের জল সামলিয়ে নিয়ে সেও অতি করুণ সুরে বললে, ধন্য।...

এ গল্পের আরও অনেকটা আছে। ভারি মজার। কিছু শোনালুম। এমন মজার গল্প কবিদাদু ছাড়া কে বলতে পারেন?

তাঁর মজার মজার কবিতাও দু-একটা শুনিয়ে দিই। এ-রকম অসংখ্য আছে। মারহাট্টা কবিতা শোনো:

হৈ রে হৈ মারহাট্টা
গালপাট্টা
আঁটসাট্টা।
হাড়কাট্টা ক্যাঁ কোঁ কীঁচ্
গড়্ গড়্ গড়্ গড়্
হুড়ুদ্দুম দুদ্দাড়

ওরে বাসরে! তারপর, তারপর?

মার্ মার্ মার্ রবে মার্ গাঁট্টা,
মারহাট্টা, ওরে মারহাট্টা।
ছুটে আয় দুদ্দাড়,
ভাঙ মাথা, ভাঙ হাড়
কোথা তোর বাসা আছে হাড়কাট্টা।

ছোটোদের এমন ছেলেমানষি কবিতা আর কোথাও শুনেছ? তাঁর কবিতার মধ্যে কলকাতা শহরটা কেমন চলে বেড়াচ্ছে। শোনো:

রাস্তা গলি যাচ্ছে চলি
অজগরের দল,
ট্রাম-গাড়ি তার পিঠে চেপে
করছে টলমল।
দোকান বাজার ওঠে নামে
যেন ঝড়ের তরী,
চউরঙ্গির মাঠখানা ঐ
যাচ্ছে সরি সরি

শুধু এই নাকি? মনুমেন্টের ব্যাপার শোনো:

মনুমেন্টে লেগেছে দোল,
উলটিয়ে বা ফেলে—
খ্যাপা হাতির শুঁড়ের মতো
ডাইনে বাঁয়ে হেলে।
ইস্কুলেতে ছেলেরা সব
করতেছে হৈ হৈ,

আর বইগুলো কী হল?

অঙ্কের বই নৃত্য করে
ব্যাকরণের বই।
মেঝের 'পরে গড়িয়ে বেড়ায়
ইংরেজি বইখানা,
ম্যাপগুলো সব পাখির মতো
ঝাপট মারে ডানা।

এগারো

কবিদাদুর কবিতা শোনানো হল, গল্প বলাও হল। এবার আবার তাঁরই কথাই বলি। পিতার আদেশে তিনি তাঁদের জমিদারি শিলাইদহতে গেলেন।

শিলাইদহ অতি সুন্দর স্থান। সেখানকার পদ্মা নদী আরও সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর। তিনি এক বড়ো নৌকোতে করে পদ্মার উপরেই বাস করতে লাগলেন। নৌকোই হল তাঁর ঘরবাড়ি। তাঁর জীবনধারা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল।

এখানে তিনি পেলেন সত্যিকারের মানুষ। পল্লীগ্রামের লোকদের ভিতরেই তিনি এক কোমল মাধুর্য পেলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর এক চিঠি তুলে দিই। তিনি লিখছেন:

> এই-সমস্ত... অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড়ো একটি কোমল মাধুর্য আছে, বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক।

এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে একটা সুখ আছে।... আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয়, তা এরা জানে না।

আর এক চিঠিতে বলেছেন:

এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা। এখানে আমার উপরে আমার সময়ের উপরে আর-কারও কোনো অধিকার নেই।... যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশ-পূর্ণ, আলোক-পূর্ণ, আলস্য-পূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।

তাঁর আর এক চিঠি:

যখন ভেবে দেখি এ-জীবনে কেবলমাত্র ৩২টি শরৎকাল এসেছে এবং গেছে, তখন ভারি আশ্চর্য বোধ হয়।... যখন মেঘমুক্ত সুন্দর প্রভাতের রৌদ্রটি এসেপড়ে তখন আমি যেন আমার এক মায়া-অট্টালিকার বাতায়নে বসে এক সুদূর বিস্তৃত ভাবরাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি এবং আমার কপালে যে বাতাসটি এসে লাগতে থাকে সে যেন অতীতের সমস্ত অস্পষ্ট মৃদু গন্ধপ্রবাহ বহন করে আনতে থাকে। আমি আলো ও বাতাস এত ভালোবাসি।...

আবার তিনি বলছেন:

সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না! মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা

পর্যন্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে না বলেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য। অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু বড়ো সামান্য নয়।...

পরের কাছে হইব বড়ো
এ কথা গিয়ে ভুলে
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণ মূলে।
অনেক দূরে লক্ষ্য রাখি
চুপ করে না বসিয়া থাকি
স্বপ্নাতুর দুইটি আঁখি
শূন্যপানে তুলে।

বারো

কবিদাদুর পদ্মার উপরের নৌকো হল তাঁর ঘরবাড়ি। অতি আনন্দে, অতি আরামে আর মনের সুখে ও অতি স্বচ্ছন্দে তিনি থাকেন সেখানে দিনরাত। কিন্তু পদ্মার ঘাটটি হল সকলেরই ঘাট। গ্রাম থেকে গ্রামের মেয়েরা কত আসে সেখানে স্নান করতে, জল নিতে, গল্পগুজব করতে। এ হল এক শান্তির স্থান। এ ছাড়া গ্রামের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কত খেলাধুলো, কত উৎপাত সেখানে।

কবিদাদু এইসব নৌকোয় বসে বসে দেখেন আর উপভোগ করেন।

ছোটোদের খেলা দেখবার মতো। ডাঙার উপরে রয়েছে অনেকগুলো গুঁড়িকাঠ গাদা করা। ছোটোরা এসে সকলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব সহকারে কাঠগুলো ঠেলে ঠেলে গড়িয়ে নদীতে ফেলতে পারা যায় তো একটা নতুন আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন এই কথা মনে হওয়া, অমনি কাজে লেগে যাওয়া।— 'সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো— মারো ঠেলা হেঁইয়ো,' বলতে বলতে কাঠ গড়িয়ে গড়িয়ে নদীতে ফেলতে লাগল। হঠাৎ এক বাধা উপস্থিত। বলা নেই কওয়া নেই, একটি ছোট্ট মেয়ে গম্ভীরভাবে এসে একেবারে গুঁড়ি চেপে বসে পড়ল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি হবার উপক্রম। একটি বড়ো ছেলে তাকে ওঠাবার কত চেষ্টা করলে, কিন্তু মেয়েটি গম্ভীর হয়ে বসেই রইল। যেন এক মস্ত বড়ো দার্শনিক। তখন সেই ছেলেটি তাকে-সুদ্ধই গুঁড়িটা উল্টে দিলে। মেয়েটা জলে পড়ে গিয়ে বিকট কান্না জুড়ে দিলে, আর কাঁদতে কাঁদতে উঠে এসে ছেলেটাকে কষে এক চড় লাগাল।

এইসব মজার ব্যাপার খেলা কবিদাদু বসে বসে দেখতেন আর খুব আমোদ বোধ করতেন।

একটি মেয়ে কবিদাদুর নৌকোর কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

অবাক হয়ে ভিতরে কী আছে ব্যগ্র হয়ে দেখত। সাথীদের হাত নেড়ে নেড়ে দেখাত। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকত। কবিদাদু দেখতেন তাকে।

যে মেয়েটি দেখত, তার মুখখানি সুন্দর। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো করে চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। দেখে মনে হয়, বেশ বুদ্ধিমতী ও সরলা। বয়স তার বারো-তেরো। কিন্তু দেখে বেশি মনে হয়।

একটি স্ত্রীলোক নাইতে এসে খুব জোর গলায় ঘর সংসারের কথা কইছে। বলছে, আমার মেয়েটির বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, কারে কী কয় জ্ঞান নেই, আপন-পর বোধ নেই। ওই যে গো দাঁড়িয়ে আছে। এই বলে সে সেই বুদ্ধিমতী সরলা মেয়েটিকে দেখালে।

শেষে একদিন হল কি— সেই চুলছাঁটা, সরলা, বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে সাজিয়ে-গুজিয়ে এনে সবাই তাকে এক নৌকোয় তুললে। তার সঙ্গে চাল-ডাল-বাসন-কোসন ঘরকন্নার জিনিস। মনে হচ্ছে, শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। মেয়েটা কিছুতেই নৌকোয় উঠবে না, আর তারাও তাকে জোর করে তুলে দেবে। কিন্তু কান্নাকাটির ভাব কারো মধ্যে নেই। কান্নাকাটি তো নেই-ই, বরং বেশ এক ফুর্তি আর আমোদের ভাব আছে। কেবল একটি ছোট্ট মেয়ে তার মায়ের কোলে রয়েছে, আর মুখ লুকিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদছে। নৌকো ছেড়ে

দিল। যে চলে গেল সে মেয়েটি বোধহয় এরই বোন। এই ছোট্ট মেয়েটি বোধহয় ওর সঙ্গে পুতুল খেলার সামিল হতো, আর বোধহয়, দুষ্টুমি করলে মাঝে-মাঝে সে একে ঢিপিয়ে দিত।

নৌকো ছেড়ে চলে গেল। কবিদাদু শুনলেন, একটি স্ত্রীলোক আর-একটি স্ত্রীলোককে বলছে— ওকে তো জানো বোন, ও ওই রকমই। কত করে বোঝালাম, পরের ঘর করতে যাচ্ছিস, বেশ সাবধানে থাকবি, ঘাড় হেঁট করে থাকবি, উঁচু করে কথা বলবি নে। কিন্তু সে কি তা পারবে?

কবিদাদু এইসব দেখতেন-শুনতেন, আর খুব উপভোগ করতেন।

তেরো

কবিদাদুর কয়েকটি চিঠি আগেই শুনিয়েছি। এবার তাঁর আরও কিছু চিঠির কথা শোনাই। চিঠির কথা— মানে চিঠির গল্প। তাঁর এইসব চিঠির কথা সব গোড়াতেই উল্লেখ করেছি, আর লোভ দেখিয়ে রেখেছি। এখন তুলে দিচ্ছি তাঁর মাত্র কয়েকখানি চিঠি বেছে বেছে। অতি চমৎকার কি না দেখো। চিঠি লিখতেন তিনি প্রীতিভাজনদের, আত্মীয়স্বজনদের, আপনার লোকদের। কত যে লিখেছেন, তার সংখ্যা যে কত তার হিসেব করা যায় না।

সে সকল অতীব মনোহারি ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁর এইসব চিঠি অর্থাৎ পত্র-সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্যের এক অতি অপূর্ব সম্পদ। সে সকল চিঠি সকলেই পড়ে দেখো, পড়বার চেষ্টা কোরো। এখন তাঁর চিঠির গল্প শোনাই।

চিঠির গল্প

১

...এখানকার এই দুপুরবেলাকার মোহ থেকে কিছুতেই আপনাকে ছাড়াতে পারিনে। এই আলোকে ছাড়াতে পারিনে। এই আলো, এই বাতাস, এই স্তব্ধতা আমার রোমকূপের মধ্যে প্রবেশ করে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে— এ আমার প্রতিদিনকার নতুন নেশা।...

...বারম্বার দেখেছি, পৃথিবীর কোনো জিনিসকেই যেন আমি শেষ করতে পারিনি। যা আমার একবার মনে লেগেছে তা আমার চিরকালই মনে লাগে এবং প্রত্যেক দিনই তার নূতনত্বে আমাকে নিবিড় বিস্ময়ে পূর্ণ করতে থাকে।...

২

যখন এই রকম লিখতে লিখতে লেখা বেড়ে যায়, এবং প্রতিদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই মনে হয় কাল সেই লেখাটা কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলুম এবং আজ কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে, তখন ভারী ভালো লাগে— দিনগুলিকে বেশ লেখায় পরিপূর্ণ করে ভরা

কলসীর মতো সন্ধেবেলায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি, এবং সেইসব লেখার ধ্বনি প্রতিধ্বনির রেশ সমস্ত শরীর মনের মধ্যে বাজতে থাকে।

তারপর লিখছেন:

আজকাল এই ছড়ার রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে আমি কত রকমের ছবি এবং কত রকমের সুখ দুঃখ ও হৃদয়-বৃত্তির ভিতর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছি তার আর ঠিকানা নেই।...

৩

দিনগুলি আজকাল অত্যন্ত সুমধুর হয়ে এসেছে— বাতাস সুশীতল, আকাশ সমুজ্জ্বল, তটরেখা শ্যামল, নদী সুপ্রশান্ত, মন স্বপ্নাতুর, কাজকর্ম স্বল্প, লেখা টেকা বন্ধ, চারিদিকে ছুটি এবং অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য-প্রবাহ। জলের কলস্বরে যেন কার অত্যন্ত সুকোমল আদরের কণ্ঠ মাখা রয়েছে; স্বচ্ছ নীলাকাশও স্নেহভারে আবিষ্ট এবং স্নিগ্ধ সমীরণও প্রীতিসুধায় পরিপূর্ণ... এই সব রঙগুলি— এই জলের গেরুয়া, এ সমস্ত কতই বেশভূষা দৃষ্টি হাসির অজস্রতারূপে আমার চতুর্দিকে শরৎ কিরণে ঝলকিত হচ্ছে!

তারপর আরও বলছেন:

সমস্ত আকাশ যেন হৃদয়পুঞ্জের মতো আমাকে বেষ্টন করে রয়েছে। আশ্চর্য এই যে, পরশু আমার এখানে যখন জনসমাগম হবে তখন এরা যেন আর এখানে থাকবে না— মানুষ এলে যেন প্রকৃতির মধ্যে আর প্রকৃতির স্থান থাকবে না। মানুষ এত বেশি জায়গা জোড়ে, চতুর্দিকে এতটা জিনিসের অপব্যয় করে!

৪

যে পারে বোট লাগিয়েছি এ পার খুব নির্জন। গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষা মাঠ ধূ ধূ করছে, নদীর ধারে ধারে খানিকটা করে শুকনো ঘাসের মতো আছে— সেই ঘাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোটাকতক মোষ চরে বেড়াচ্ছে। আর, আমাদের দুটো হাতি আছে, তারাও এ পারে চরতে আসে। তাদের দেখতে বেশ মজা লাগে।

তারপর এই হাতির আহারের কথা বলছেন:

একটা পা উঠিয়ে ঘাসের গোড়ায় দু-চার বার একটু একটু ঠোকর মারে, তারপরে শুঁড় দিয়ে টান মারতেই বড়ো বড়ো ঘাসের চাপড়া একেবারে মাটিসুদ্ধ উঠে আসে, সেই চাপড়াগুলো শুঁড়ে করে দুলিয়ে দুলিয়ে ঝাড়ে, আর মাটিগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায়, তার পরে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে খেয়ে ফেলে।

আরও বর্ণনা দিচ্ছেন:

এক-এক সময় খেয়াল যায়, খানিকটা ধুলো শুঁড়ে করে নিয়ে ফুঁ দিয়ে নিজের পেটে পিঠে সর্বাঙ্গে হুস্ করে ছড়িয়ে দেয়— এই রকম তো হাতির প্রসাধন-ক্রিয়া। বৃহৎ শরীর, বিপুল বল, শ্রীহীন আয়তন, অত্যন্ত নিরীহ— এই প্রকাণ্ড জন্তুটাকে দেখতে আমার বেশ লাগে।... এর সর্বাঙ্গের অসৌষ্ঠব থেকে একে একটা মস্ত শিশুর মতো মনে হয়। তা ছাড়া জন্তুটা বড়ো উদার প্রকৃতির— শিব ভোলানাথের মতো— যখন খেপে তখন খুব খেপে, যখন ঠান্ডা হয় তখন অগাধ শান্তি...

৫

আজকাল আমার সন্ধ্যাভ্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে। সেটি আর কেউ নয়, আমাদের শুক্লপক্ষের চাঁদ। কাল থেকে আর তাঁর দেখা নেই। ভারি অসুবিধে হয়েছে, শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে যায়, যথেষ্ট বেড়াবার পক্ষে একটু ব্যাঘাত জন্মায়।

তার পরের বর্ণনা অপূর্ব:

আজকাল ভোরের বেলায় চোখ মেলেই ঠিক আমার খোলা জানলার সামনেই শুকতারা দেখতে পাই— তাকে আমার ভারি মিষ্টি লাগে— সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে, যেন বহু কালের আমার আপনার লোক। মনে আছে, যখন শিলাইদহে কাছারি করে সন্ধেবেলায় নৌকো করে নদী পার হতুম, এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারি একটা সান্ত্বনা বোধ হত।

বলে চলেছেন:

ঠিক মনে হত, আমার নদীটি যেন আমার ঘর সংসার এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী— আমি কখন কাছারি থেকে ফিরে আসব এইজন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম! তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বাতাসটি ঠান্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারি একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশান্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব স্পষ্টরূপে প্রায়ই মনে পড়ে।

আবার বলেছেন :

ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্য সহচরী না মনে করে থাকতে পারি নে; সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণ-কামনার মতো ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ করতে থাকে।

৬

... দেশের লোকের... উল্টো ধারণা। যা কিছু ভিতরকার কাজ, যা গোপনে থেকে করতে হবে, সে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে; যেটা নিতান্ত অস্থায়ী আস্ফালন এবং আড়ম্বর মাত্র সেইটেতেই তাদের যত ঝোঁক।

আক্ষেপ করছেন:

আমাদের এ বড়ো হতভাগা দেশ। এখানে মনের মধ্যে কাজ করবার বল রাখা বড়ো শক্ত। যথার্থ সাহায্য করবার লোক কেউ নেই। যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে প্রাণ সঞ্চয় করা যায় এমন মানুষ দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না। কেউ চিন্তা করে না, অনুভব করে না, কাজ করে না; বৃহৎ কার্যের, যথার্থ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা কারও নেই; বেশ একটি পরিণত মনুষ্যত্ব কোথাও পাওয়া যায় না।

তারপর বলছেন:

সমস্ত মানুষগুলো যেন উপছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে দাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে, ঘুমচ্ছে, তামাক টানছে, আর নিতান্ত নির্বোধের মতো বকর্ বকর্ বকছে। যখন ভাবের কথা বলে তখন সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ে, আর যখন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষি করে। যথার্থ মানুষের সংস্রব পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারী একটা তৃষ্ণা

থাকে। কিন্তু সত্যকার রক্তমাংসের শক্তসমর্থ মানুষ নেই— সমস্ত উপছায়া, পৃথিবীর সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বাষ্পের মতো ভাসছে।

৭

... চারটের সময় তারপুরে পৌঁছনো গেল। এইখানে আমাদের পাল্‌কি-যাত্রা আরম্ভ হল। মনে করলুম, ছ-ক্রোশ পথ। সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই আমাদের কুঠীতে পৌঁছতে পারব। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, মাইলের পর মাইল কেটে যাচ্ছে, ছ-ক্রোশ পথ আর ফুরোয় না। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় বেহারাদের জিজ্ঞাসা করলুম, আর কত দূর। তারা বললে, আর বেশি নেই, তিন ক্রোশের কিছু উপর বাকি আছে। শুনে পালকির মধ্যে একটু নড়ে চড়ে বসলুম।

নড়ে-চড়ে বসলেন বটে, কিন্তু তাতেও বিপদ। বলছেন:

পালকিতে আমার আধখানা বৈ ধরে না; কোমর টন্ টন্ করছে, পা ঝিন্ ঝিন্ করছে, মাথা ঠক্-ঠক্ করছে— যদি নিজেকে তিন-চার ভাঁজ করে মুড়ে রাখবার কোনো উপায় থাকত তাহলেই এই পাল্‌কিতে কিছু সুবিধে হতে পারত। রাস্তা অতি ভয়ানক। সর্বত্রই একহাঁটু কাদা।... পিছলের ভয়ে বেহারারা অতি সাবধানে এক-এক পা করে পা ফেলছে— তিন-চারবার তাদের পা হড়কে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সামলে নিলে। অমনি করে খানিক দূর এসে পর বরকন্দাজ জোড়হাতে নিবেদন করলে, একটা নদী এসেছে, এইখানে পাল্‌কি নৌকো করে পার করতে হবে। সেই অন্ধকার নদীতীরে বরকন্দাজগুলো ভাঙা গলায় ঊর্ধ্বশ্বাসে নৌকোওলাকে ডাকতে লাগল; 'মুকুন্দো— ও-ও-ও, নীলকণ্ঠ— অ-অ-অ'— এমন কাতর স্বরে আহ্বান করলে গোলকধাম থেকে মুকুন্দ এবং কৈলাসশিখর

থেকে নীলকণ্ঠ নেমে আসতেন কিন্তু কর্ণধার কর্ণ রোধ করে অবিচলিত ভাবে নিজ নিকেতনে বিশ্রাম করতে লাগল। নির্জন নদীতীরে একটি কুঁড়েঘর মাত্রও নেই। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে গেল।

তখন কী হল?

এমন সময় হুঁই-হাঁই হুঁই-হাঁই শব্দে বরদার পাল্‌কি এসে উপস্থিত হল। বরদা নৌকো আসবার সম্ভাবনা না দেখে হুকুম দিলেন, পাল্‌কি মাথায় করে নদী পার করতে হবে। শুনে বেহারারা অনেক ইতস্তত করতে লাগল এবং আমার মনেও দয়া এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধা উপস্থিত হতে লাগল। যা হোক, অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর তারা হরিনাম উচ্চারণ করতে করতে পাল্‌কি মাথায় করে নদীর মধ্যে নামলে। বহু কষ্টে নদী পার হল। তখন রাত সাড়ে দশটা।...

৮

... কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার দুই বন্ধুকে নিয়ে এই এলাকার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করানো আমার কর্তব্য মনে করে বেরিয়ে পড়া গেল। তখন সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু অন্ধকার হয় নি।... প্রায় মাইল খানেক গিয়ে একটা বাঁধের ধারে একসার তালবন এবং তালবনের কাছে একটা মেঠো ঝরনার মতো আছে, সেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, এমন সময়ে দেখি উত্তরে নীল মেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হয়ে চলে আসছে এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্‌দন্ত বিকাশ করছে। আমাদের সকলেরই মত হল, এরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘরের মধ্যে বসে দেখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ।... বাড়ি মুখে যেমন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষ গর্জনে একটা ঝড়

আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল।... ধুলোয় এমনি অন্ধকার হয়ে এল যে পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল : কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটে গুলির মতো আমাদের বিঁধতে লাগল; মনে হল বাতাস পিছন থেকে ঘাড় ধরে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে; ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টিও পিট্ পিট্ করে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগল।

তখন কী হল?

খোয়াইয়ের ভিতর নামতে হয়, সেখানে সহজ অবস্থাতেই চলা শক্ত, এই ঝড়ের বেগে চলা আরও মুশকিল। পথের মাঝে আবার পায়ে কাঁটাসুদ্ধ একটা শুকনো ডাল বিঁধে গেল; সেটা ছাড়াতে গিয়ে, বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলবার চেষ্টা করে।

... বাড়ির কাছাকাছি আসতেই তিন-চারটে চাকর মহা সোরগোল করে দ্বিতীয় আর-একটা ঝড়ের মতো আমাদের উপরে এসে পড়ল। কেউ আহা-উহু বলে, কেউ পথ দেখাতে চায়, কেউ আবার মনে করে বাবু বাতাসে উড়ে যাবেন, বলে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরে। এই সমস্ত অনুচরদের দৌরাত্ম্য কাটিয়ে, এলোমেলো চুলে, ধূলিমলিন দেহে, সিক্ত বস্ত্রে, হাঁপিয়ে বাড়িতে এসে পড়লুম। যা হোক, একটা খুব শিক্ষালাভ করেছি।

কী সে শিক্ষা?

হয়তো কোন্‌দিন কোন্ কাব্যে কিম্বা উপন্যাসে বর্ণনা করতে বসতুম, একজন নায়ক মাঠের মধ্যে দিয়ে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি ভেঙে নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ করে অকাতরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আর এরকম মিথ্যা কথা লিখতে পারব না; ঝড়ের সময় কারও মধুর মুখ মনে রাখা

অসম্ভব— কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবে না সেই চিন্তাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে।...

৯

আমাদের নতুন জলিবোটটাকে নদীর মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানাটি পেতে ঠান্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চিৎ হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি। চোখের উপরে আকাশ তারায় একেবারে খচিত হয়ে ওঠে। আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনও জন্মগ্রহণ করব! আর কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায়, এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর, বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব!

আক্ষেপ করছেন:

হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধেবেলা আর কখনও ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্যপরিবর্তন হবে— আর, কী রকম মন নিয়েই বা জন্মাব! এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপর এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকব!... আমার সবচেয়ে ভয় হয়, পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই এবং পড়ে থাকলেও সকলে ভারি দোষের বিবেচনা করে। হয়তো একটা কারখানায়, নয়তো ব্যাঙ্কে, নয়তো পার্লামেন্টে, সমস্ত দেহমন প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে।... ভারি ছাঁটা-ছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই

কল্পনাপ্রিয়, অকর্মণ্য, আত্মনিমগ্ন, বিস্তৃত-আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না। জলিবোটে পড়ে পড়ে জগতের সেই কাজের লোকের কাছে আপনাকে কিছুমাত্র খাটো মনে হয় না।...

১০

অনেক দিন পরে কাল মেঘবৃষ্টি কেটে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল। পৃথিবীতে যে রোদ্দুর আছে সে কথা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম; হঠাৎ যখন কাল দশটা-এগারোটার পর রোদ্দুর ভেঙে পড়ল তখন যেন একটা নতুন জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হল। দিনটি বড়ো চমৎকার হয়েছিল।

তারপর কী দেখলেন? যা দেখলেন তা চমৎকার। বলছেন:

যতদূর দৃষ্টি যায়... কেবলই শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তভাগে গাছপালার একটুখানি ঝাপসা নীল আভাস মাত্র। ঘুঘু ডাকছে এবং মাঝে মাঝে গোরুর গলার নূপুর শোনা যাচ্ছে। কাঠবিড়ালি একবার লেজের উপর ভর দিয়ে বসে মাথা তুলে চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে। খুব একটা নিঝুম নিস্তব্ধ ভাব। বাতাস অবাধে হু-হু করে বয়ে আসছে, নারকেল গাছের পাতা ঝর ঝর শব্দ করে কাঁপছে।...

চোদ্দ

কবিদাদুর চিঠি পড়লে। দু-চারখানি মাত্র দেখলে। এরকম শত শত শত চিঠি আছে তাঁর। চিঠিগুলি যত বেশি পারো পোড়ো— পড়বার চেষ্টা কোরো।

চিঠি পড়ে দেখলে তো, কেমন করে গরিব চাষা-ভূষো তাঁর আপন হয়, পল্লীগ্রাম তাঁর কত ভালো লাগে, আর পদ্মা তাঁর একান্তভাবে কত আপনার। নৌকো-পথে গ্রাম থেকে গ্রামে পরিভ্রমণ তাঁর কত বেশি প্রীতিপ্রদ। প্রকৃতি— যেমন, বৃক্ষলতা, ফুল পাতা, হরিৎ তৃণ, আকাশ, বাতাস, মেঘ, রৌদ্র— এ সকল তাঁরই প্রাণের সঙ্গে মেশানো। এমনটি কি আর কারো আছে! মাঠ, হরিৎ মাঠের শোভা, নদী, নদীর জল— এ সকলের মধ্যে তিনি আত্মহারা হন। তাঁর মতো অপূর্ব, অসাধারণ মানুষ কি হয়!

কবিদাদুর সবই বিচিত্র। তিনি যে ছবিও আঁকেন খুব ভালো, সে কথা সকলেরই জানা। ছবি আঁকতে যখন তিনি আরম্ভ করেন, তখন তাঁর বয়স ৭০ বৎসর। এত বেশি বয়সে ছবি আঁকা আরম্ভ করে পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হতে পারা খুব আশ্চর্যের কথা নয় কি? তিনি কিন্তু তাই-ই হয়েছেন। তাঁর সবই বিচিত্র, সবই অনন্যসাধারণ। তাঁর আঁকা ছবিগুলিও বিচিত্র এবং অনন্যসাধারণ। তাঁর

আঁকা ছবি আছে হাজার হাজার। ছবি সম্বন্ধে নিজে তিনি কী বলছেন শোনো:

> ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রং বলো কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই— আমি বাঙালি বলেই এটা আপন হতে বাঙালির জিনিস নয়। যেমন, কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে।

তারপরে বলেছেন:

> এইজন্যে স্বতই ছবিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে দান করেচি। জার্মানিতে আমার ছবির যথেষ্ট আদর হয়েচে। বার্লিন ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েচে।

কবিদাদুর ছবির আদর এখন পৃথিবীর সর্বত্র।

কবিদাদু অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কি ঘরের মধ্যেই আটকে থাকতেন? তা অবশ্য থাকতেন না। তিনি সারা ইউরোপ এবং চীন, জাপান, আমেরিকা, আফ্রিকা কতবার যে গেছেন, কতবার যে ভ্রমণ করেছেন, সে সকলের বিবরণ অতীব বিচিত্র ও শিক্ষাপ্রদ। ইউরোপের মনীষীরা কবিদাদুকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন, যেমন— রোমাঁ রোলাঁ, বার্নার্ড শ', আইনস্টাইন, ফ্রয়েড— ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁরা কেউ এখন বেঁচে নেই।

সোবিয়েত রাশিয়াতেও তিনি ভ্রমণে গেছলেন সাদর নিমন্ত্রণ পেয়ে, ১৯৩০ সালে। রাশিয়া দেখে কবিদাদু বিস্ময়ে বলেছেন:

...রাশিয়ায় এসেছি— না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কান্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস।... ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই।... এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে, সেটা দেখে আমি সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি।... হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে।...

ওদের কাজ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে বলছেন:

...ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন? আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত? আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের।...

রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা দেখে অবাক হয়ে বলছেন:

...এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম, তার অতি অল্প পরিমাণ [আমাদের] থাকলেও কৃতার্থ হতুম।...

তারপর আরও বলছেন:

...এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হূ হূ করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা— কেবলমাত্র মাথা-গুনতিতেই তার গৌরব।... কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ করে এম. এ. পাস করবার মতন নয়।

পৃথিবীর সর্বত্র তিনি বহু পূর্ব হতেই ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। ছেলেবেলাতে সতেরো বৎসর বয়সে প্রথম গেছলেন ইংলন্ডে।

তারপর তো বহুবার, সবসুদ্ধ সাতবার গেছলেন ইংলন্ডে। ফ্রান্সে গেছলেন চারবার। জার্মানিতে চারবার।

আমেরিকা মহাদেশে গেছলেন পাঁচবার। আমেরিকার লোকেরা তো তাঁকে যিশুখ্রিস্টের অবতার বলে পূজা করেছিলেন।

'সূর্যোদয়ের দেশ' জাপানেও গেছলেন। গেছলেন তিনবার। চীন দেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখানে তাঁর আদর অভ্যর্থনার অন্ত ছিল না। রাজার অধিক পূজা পেয়েছিলেন এখানে। এখানে গেছলেন ১৯২৪ সালে।

দ্বীপময় ভারত অর্থাৎ জাভা, সুমাত্রা, বালীদ্বীপেও গেছলেন, ১৯২৭ সালে। এখানে অতি বিশাল বরবুদর মন্দির দেখে বিস্মিত হন। এ হল হিন্দুর কীর্তি। এখানকার লোকেরা আদিতে ছিলেন হিন্দু। এখনো তাঁরা হিন্দু।

পারস্য দেশে যাওয়ার পথ তখন সুগম ছিল না। কবিদাদু সেখানেও গেছলেন ১৯৩২ সালে। পারস্য হল কবির দেশ, কবি সাদি ও হাফেজের জন্মস্থান। এখান থেকে গেছলেন বোগদাদ। এসব জায়গায় তাঁর আদর অভ্যর্থনার সীমা-পরিসীমা ছিল না।

সিংহলে তিনি গেছলেন ১৯৩৪ সালের জুন মাসে। এই-ই তাঁর শেষ সফর। তিনি তেরোবার ভ্রমণ করেছিলেন পৃথিবীর তিরিশটি দেশে। সব জায়গাতেই তিনি অপূর্ব সমাদর, সম্মান, পূজা এত আন্তরিকভাবে পেয়েছিলেন যে, তেমন আদর

অভ্যর্থনা সম্মান রাজারাও পান না। তাঁর ভ্রমণের বিবরণ পোড়ো। পড়লে বুঝবে, আমাদেরই এই রবীন্দ্রনাথ কত বড়ো, কত উচ্চ, কত মহান, আর কেন তিনি পৃথিবী-পূজ্য।

কবিদাদু সারা পৃথিবীবাসীর বন্ধু। এই বিশ্বজগতের কে তাঁর আপনার নয়! সকলেরই তিনি বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, সমদরদী, আপনার জন। তাই তো সারা পৃথিবীর মানুষ, আজ তাঁকে পূজা করছে দেবতার আসনে বসিয়ে।

কবিদাদুর এত ভালোবাসা, এত প্রেম-প্রীতি এলো কী করে? এ সবই প্রকৃতির বিধান— বিশেষ করে তাঁর উপর। কেননা, তিনি সেই বিচিত্রের দূত। তাঁর আত্মপরিচয় কী? নিজেই তিনি তা দিয়েছেন সুস্পষ্ট করে। বলছেন:

> আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি।... বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা— এ আমার কাজ।... পথের দুই ধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুল পাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে-বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে... তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালায় বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এই-ই আমার একমাত্র পরিচয়।

এমন অপরূপ কথা কেউ কি বলেছেন? এই সকল কথা তাঁর জীবনে অবিকল প্রতিফলিত হয়েছে বলেই তিনি আজ পৃথিবীপূজ্য।

কবিদাদুর কথা শেষ করি। কিন্তু শেষ করবে কে? কার সে

যোগ্যতা? তিনি কি মানুষ ছিলেন? তাঁর লেখা অর্থাৎ সমস্ত লেখা কোনো লোক আজীবন পড়েও নিঃশেষে শেষ করতে পারেন কি না সন্দেহ। তিনি অত অপর্যাপ্ত লিখলেন কী করে, সেই ভেবেই অবাক হতে হয়। শুধু অবাক হওয়া নয়— মনে হয়, কবিদাদু ছিলেন মানবদেহধারী দেবতাত্মা।

কীসে তিনি দেবতাত্মা? তিনি ভারতকে গানের ও ধ্যানের অক্ষয় লোকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, আর তাকে মনোলোকে উন্নীত করে গেছেন— যা অবিনশ্বর হয়ে থাকবে এই পৃথিবীরই সঙ্গে সঙ্গে।

কবিদাদুর কথা শেষ করি এই বলে যে, তিনি সারা বিশ্বের পূজা পেয়েছেন, পূজা পাচ্ছেন এবং পাবেনও চিরকাল ধরে— পাবেন দেবতার চেয়েও অধিক পূজা।

...নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।...

Collect More Books >
From Here

আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি
হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি।
বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে
লীলায়িত করা— এ আমার কাজ।
তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি,
তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে
সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর,
এই—ই আমার একমাত্র পরিচয়।

প্রচ্ছদ: সুযুগ রায়